দৈনিক জনকণ্ঠ
14 APR 1997 পৃ: ২৫ কলাম ৭

শিশুশিক্ষা

মঞ্জু সরকার

ফুলকলি কিন্ডারগার্টেন স্কুলটি হাজি বশির উল্লার নবতম কারখানা, যা একই সঙ্গে আনন্দের খনি কিংবা মজাদার এক আবিষ্কার। চৌবাচ্চায় স্নানকালে আর্কেমিডিস তাঁর সূত্র আবিষ্কারের আনন্দে যেমন ইউরেকা-ইউরেকা বলে চেঁচান, স্কুল উদ্বোধনের পর অনেকটা সেরকম মেজাজ নিয়ে তিনি ঘরে ডাকেন।
আসেন এবং খুশি উপচানো গলায় আট বছরের নাতিকে ডাকেন।
কইরে বাবলা! হালা তোর লাইগা একখান ইংরোজী স্কুল বানায় দিলাম।
বাবলা দাদুর খুশিতে ষোল আনা ভাগ বসাবার আগ্রহে ব্যাকুল ও বিস্মিত কণ্ঠে
জানতে চায়, দাদা ওইটা আমার স্কুল! সত্য আমার স্কুল?
হ, তোরই স্কুল তো। অক্ষণ আর প্রগতি স্কুলে তোর যাওন লাগব না। সিঁড়ি দিয়া নিচে
নামলেই তোর স্কুল।
আমার স্কুলে আমি মাষ্টারি করুম। শয়তান পোলাপান গো বেত দিয়া বাইড়ামু।
নাতির কথায় বংশের দৈন্য ও তার শিক্ষার আগ্রহ গভীরভাবে ধরা পড়ে। কিন্তু
মন্তব্যটিকে নিছক শিশুর পাকামি কিংবা বিশুদ্ধ রসিকতা ধরে নিয়ে বশির উল্লা
অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। এরকম হাসলে তার দাড়ি নড়ে, ভুঁড়িও কাঁপে।
ও বউমা হোনো, তোমার পোলায় কয় কী, হোনো।
বাবা, বাড়িতে স্কুল বানাইলেন। বাবলা আর স্কুলে যাবে না দেখবেন।
যাইব না মানে! মহল্লার ভদ্র ফেমিলির বেবাক পোলাপান এই স্কুলে আইব। দেহো না,
এই স্কুল লইয়া কী তেলেসমাতি কাণ্ড করি আমি।
স্কুল নিয়ে এ ধরনের পারিবারিক আলাপচারিতা ও হাসি তামাশায় সম্ভাবনাময়
কীর্তিটির সৃষ্টি রহস্য সামান্যই প্রকাশ পায়। আবার বাইরে থেকে দেখলে স্কুলের সঙ্গে
হাজি বশির উল্লার সম্পর্কটি বিকৃত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ সবাই জানে,
মহল্লায় সেরা পয়সাওয়ালা লোকদের মধ্যে বশির হাজি অন্যতম। এটা প্রমাণের জন্য
সুবিশাল তিনতলা বশির ভিলাটি যথেষ্ট। তার ওপর আছে হাজি বশির উল্লা সুপার
মার্কেট, দু'টি ইটখোলা (যেখানে HBU এবং MNU মার্কা আছে, একই আকার
ও রঙ নিয়ে লাখ লাখ ইট তৈরি হয়), বুড়িগঙ্গার তীরে ইটা-বালুর গদি এবং রড-
সিমেন্টের দোকান। এ ছাড়াও যে কতখানে এবং কতভাবে তার টাকা ডিম পাড়ে,
বলা মুশকিল।
ইটখোলার সামান্য শ্রমিক হিসাবে যার জীবন শুরু, সেই লোক এখন কোটিপতি।
মহল্লার পুরনো বাসিন্দারা তো জানে, বেকার ও আর্থিক আয়-উপার্জনে অক্ষম
ব্যক্তিরাও হাজি বশির উল্লার কোটিপতি হওয়ার প্রকাশ্য ও গোপন রাস্তাগুলো
বিশেষভাবে চেনে।
কাজেই বশির ভিলার নিচতলায় হঠাৎ একদিন ফুলকলি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বিরাট
সাইনবোর্ড দেখে মহল্লাবাসী চমকে উঠলেও স্কুলের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে কারও মনে
প্রশ্ন জাগে না। এই বাড়ির ছাদে মহল্লার প্রথম ডিশ এ্যান্টেনা দেখেও মানুষ চমকে
উঠেছিল। যাদের ঘরে রঙিন টিভি আছে, তারাও নতুন অবস্থায় হাজি বাড়ির ডিশ
এ্যান্টেনার দিকে তাকিয়ে কল্পনায় বিদেশী অনুষ্ঠান দেখার মজা ও বিস্ময় অনুভব
করত। এখন তারা বাস্তবে ঘরে বসেই দেখতে পায়। হাজির ছোট ছেলে মহল্লার বহু
বাসায় সংযোগ দিয়েছে। প্রতিমাসে তার এসিসট্যান্টরা সংযোগ ভাড়া আদায় করে।
এখন যাদের ঘরে টিভি নেই, তারা পর্যন্ত ডিশ এ্যান্টেনার দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানের
বিস্ময় অনুভব করে না আর। কারণ ঐ ছাতাটি যে হাজির টাকা বাড়াবার জন্য শূন্যে
হা মেলে আছে, বুঝে গেছে সবাই।
স্কুল নিয়েও হাজি নিশ্চয় ভাল ব্যবসা করবে। মহল্লাবাসীর এমত ধারণা পাকাপোক্ত
হয় স্কুল সম্পর্কিত প্রচারণার বহর দেখে। শীতের শুরুতে রাস্তায় রাস্তায় টাঙ্গানো হয়
লাল রঙের ব্যানার। ফুলকলি স্কুলে প্লে গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির সুখবরটি
বাতাসে ওড়ে। আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ সব স্থান ছাড়াও পোস্টার লাগানো হয় প্রত্যেক
বাড়িতে, রিক্সার পিছনে, বিদ্যুতের খাম্বায়, মোটা ও চিকন গাছের গোড়ায়, এক
কথায় যত্রতত্র। এমনকি মহল্লার একমাত্র খাঁটি দুধ সরবরাহকারী অস্ট্রেলিয়ান গাভীর
খামারটিও বাদ যায় না। ব্যানার ও পোস্টারের ছড়াছড়ি দেখে নিরক্ষর রিক্সাঅলা
বিজ্ঞজনকে জিজ্ঞেস করে, ভোট কি আইয়া পড়ল ভাই? এভাবে লোকমুখে
নিরক্ষরজনও হাজির স্কুলের সুখবর জেনে যায়।
ছেলেমেয়েকে ভাল স্কুলে পড়ানোর স্বপ্ন যাদের, পোস্টারের ভাষা তাদের আকৃষ্ট করে।
ঢাকা শহরের প্রথম শ্রেণীর কেজি স্কুলের অনুরূপ মানসম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চয়তা, স্বল্প
বেতন, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এবং মনোরম পরিবেশের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তারা
বিভিন্ন স্থানে নানা রকম দূরত্ব থেকে একই পোস্টার বার বার পড়তে থাকে। সব
পোস্টারের একই কথা তাদের আশ্বস্ত করে। বশির ভিলার নিচতলার দিকে তাকালেও
অবিশ্বাস করার উপায় নেই। হাজি বশির উল্লার মতো কোটিপতি লোকের পক্ষে শুধু
কেজি স্কুল কেন, মহল্লায় একটি মানসম্পন্ন কলেজ গড়ে তোলাও খুব একটা কঠিন
কাজ নয়। কিন্তু কথা হলো, ইটা-বালুর ব্যবসায়ের সঙ্গে হাজির সম্পর্ক যতটা
মানানসই, একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক ততটাই বেমানান।
ইংরেজী দূরের কথা, বাংলা ভাষাটাও ঠিক মতো পড়তে ও লিখতে পারে না লোকটা।
ব্যাংকের চেক স্বাক্ষর করতে গেলে এখনও হাত কাঁপে। কাজেই মহাসমারোহে
বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠার মূলে শুধু টাকা কামানো নয়, আরও কোন রহস্য থাকা
স্বাভাবিক। মহল্লার লোকজন এ রকম সন্দেহ করতে থাকে।
বশির ভিলায় বিবাহ, আকিকা বা মোসলমানি উৎসবের মতো স্কুলের উদ্বোধনী
অনুষ্ঠানও বেশ ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রণপত্রে স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান
হিসাবে আলহাজ্ব বশির উল্লা এবং প্রিন্সিপাল হিসাবে রেবেকা ইসলাম বিএ (অনার্স),
এমএ (ইংলিশ) নাম ছাপা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে আমানত শাহ এমপি এবং
বিশেষ অতিথি হিসাবে মহল্লাবাসী-সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম
আখন্দ আসেন। বাড়ি সংলগ্ন ফাঁকা প্রাঙ্গণে শামিয়ানা, মাইক, চেয়ার এবং বাবুর্চিদের
খিচুড়ি রান্নার গন্ধ অনুষ্ঠানে উৎসবের আমেজ আনে। এমন অনুষ্ঠানে প্রেজেন্টেশন
দেয়ার ঝামেলা না থাকায় কার্ড পেয়ে এবং পত্র না পেয়েও বহু লোক অনুষ্ঠানে যোগ
দেয়। মঞ্চের সামনে বসে স্কুলের ড্রেস পরে ৫০টি ফুলকলি, পিছনে তাদের বাবা-মা।
স্কুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ ছাড়াও অনুষ্ঠানে কৌতূহলী,
খিচুড়ি কিংবা আমোদ প্রত্যাশী দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা বেশি।
ফুলকলি স্কুলের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের ফুল দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে
দর্শক-শ্রোতারা বিপুল করতালি দেয়। অতঃপর স্কুলের শুভযাত্রাকে উৎসাহিত করার
জন্য মাইকের চিৎকার সভাস্থল পেরিয়ে মহল্লার অনেক ঘরে ঘরে গিয়েও পৌঁছে।
শিশুশিক্ষার গুরুত্ব, ফুলকলি স্কুলের ভবিষ্যত, শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী উদ্যোগ আর
সমাজসেবকদের ভূমিকা নিয়ে বক্তাগণ বিস্তর ভাল ভাল কথা বলেন। স্কুলের
প্রিন্সিপাল ও বিশেষ অতিথি তাঁদের বক্তৃতায় ইংরেজী কোটেশন ব্যবহার করেন। এসব
দামী কথা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা চলে, কিন্তু গল্পে এতসব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ঠাঁই দেয়া
মুশকিল। তবে সভাপতির ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা প্রয়োজন। এই ভাষণ দিয়ে
হাজি বশির উল্লা প্রধান অতিথির চেয়েও অন্তত তিনগুণ বেশি করতালি লাভ করেন।
অন্যদিকে এই স্মরণীয় ভাষণে স্কুল প্রতিষ্ঠার কারণ ও স্কুল ঘিরে তাঁর স্বপ্ন প্রকাশ
করতে পারার আনন্দে হাজি সাহেবের বুকখানাও বেশ হালকা হয়ে যায়।
মঞ্চে ফুলের তোড়া গ্রহণের সময় ফুলদাতা শিশুটিকে আদর করে তিনি অবশ্য স্কুলের
প্রতি তাঁর ভালবাসা ও স্বপ্ন খানিকটা প্রকাশ করেছিলেন। স্কুলের প্রিন্সিপাল রেবেকা
ইসলাম হা করা হাসি নিয়ে অপলক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলেন। প্রধান অতিথিকে
ফুল দেয়ার জন্য হাজি সাহেবের নাতিকে, আর হাজি সাহেবকে ফুল দেয়ার জন্য এই
ছেলেটিকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন।
ছেলেটির নাম শামসু। হাজি সাহেবের দোকানের সামান্য এক কর্মচারীর সন্তান।
মহল্লায় স্বল্প টাকা ভাড়ার টিনের চালা ঘরে বাস করে। শামসু আগে স্থানীয় সরকারী
প্রাইমারি স্কুলে যাতায়াত করত। স্কুল যাতায়াতের পথে হাজির স্কুলের হাজার হাজার
পোস্টার সে মুখস্থ করে ফেলেছে। ছেলেটার বেরেন ভাল— প্রমাণ করতে গিয়ে তার
পিতা এই গল্প শুনিয়েছিল হাজিকে। আরও জানিয়েছিল, পরীক্ষায় অঙ্কে ১০০-এর
মধ্যে ৯৯ এবং ইংরেজীতে ৭৫ পাওয়ার খবর। ছেলেটিকে দেখতে চেয়েছিলেন হাজি।
জিজ্ঞেস করতেই ঠোঁটস্থ কবিতার মতো পোস্টারের কঠিন সুন্দর কথাগুলো নির্ভুল
উচ্চারণ করেছিল শামসু। এরপর হাজি বশির উল্লার সুপারিশে বিনা ফিতে প্রিন্সিপাল
তাকে ফুলকলিতে ভর্তি করিয়ে নেন। হাজি সাহেব তাকে স্কুল ড্রেস কেনার জন্য টাকা
পর্যন্ত দিয়েছেন। ফুলকলির উপযুক্ত ড্রেস পরে সেই শামসু তাকে ফুল দিতে এলে,
হাজি সাহেব তার মাথা চিবুক নেড়ে আদর করেন। ফুলের চেয়েও প্রকৃত ফুলকলির
জন্য তার মমতা ও স্বপ্ন গোপন থাকেনি তখন। কিন্তু স্কুল প্রতিষ্ঠার আসল রহস্য
জানতে অধীর দর্শক-শ্রোতা এই সূক্ষ্ম নীরব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিল না। হাজির ভাষণ
শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল তারা।
মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে হাজি বশির উল্লা প্রথমে তাঁর প্রধান দুর্বলতাটি জোর গলায়
প্রকাশ করেন, আপনারা জানেন আমি অশিক্ষিত মানুষ। এর পর শিশুশিক্ষার গুরুত্ব

বোঝাতে গিয়ে শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণের ঝোঁকে এবং দ্রুত বলার আবেগে শিশুশিক্ষাকে
বিকৃত করে বললেন, 'জ্ঞানী-গুণীজনের কাছে আপনারা হুনলেন যে, শিশুশিক্ষাটাই
হইল- গিয়া আসল শিক্ষা।' এরপর কথাটার সত্যতা বোঝাতে গিয়ে হাজি সাহেব
নিজের শৈশবের গল্প শোনান। মহল্লায় তখন একটিও স্কুল ছিল না। মসজিদের মক্তবে
গিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে আলিফ বা তা পড়াই ছিল তাদের একমাত্র শিক্ষা। এ সময়
হুজুরের কাছে কায়দা আমসিপারা পড়তে গিয়ে বশির আল্লার সুরা-কালাম যেটুকু
মুখস্থ করেছিলেন, সেটুকু সম্বল করে হাজি বশির এখনও আল্লার এবাদত করে
যাচ্ছেন। বয়স বেড়েছে, নবীজীর জবানের দেশ মক্কা-মদিনা ঘুরে এসেছেন, কিন্তু নতুন
করে আর একটিও সুরা মুখস্থ করতে পারেননি। ব্যক্তিগত দুর্বলতার উল্লেখ করে হাজি
সাহেব আবারও শোনালেন, শিশিগুক্ষাটাই পোলাপানগো জীবনের ভিত্তি পাকা কইরা
দেয়।
দর্শক-শ্রোতারা সহাস্য করতালি দিয়ে তার বক্তব্যকে স্বাগত জানায়। অতঃপর স্কুল
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও স্কুল ঘিরে স্বপ্নের কথা বোঝাতে গিয়ে হাজি সাহেব তাঁর ব্রিক
ফিল্ডের গল্প শোনান। সেখানে এক নম্বর, দুই নম্বর এবং তিন নম্বর মাল পর্যন্ত
তৈরি হয়। কন্ট্রাকটাররা তিনকে দুই এবং দুইকে এক নম্বর হিসাবে চালিয়ে দেয়।
সিমেন্টে মাটি মেশায়। আর ভেজাল মালে তৈরি হয় যে বিল্ডিং, তার ভবিষ্যত নিয়ে
ভয় থাকে। শিশুশিক্ষায় ভেজাল দিলেও তেমনি, শিশুটির মানুষ হওয়ার নিশ্চয়তা
থাকে না। এ রকম ব্যাখ্যা দেয়ার পর সভাপতি জোর গলায় ঘোষণা দেন, 'আমাদের
স্কুলে এক নম্বর মাল তৈরি হইব। ভেজাল দেয়ার কোন নিয়ম থাকব না।'
এই ও বিপুল করতালির মধ্যে হাজি সাহেবের সত্য ভাষণের জোর বাড়ে। তিনি
জানান যে, শিক্ষা-দীক্ষা না থাকার ফলে শিক্ষিত এবং সরকারী অফিসের
কর্তাজনদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর বুক কাঁপে। কিন্তু ফুলকলি স্কুলের ছাত্ররা,
ভাইসব, হ্যারা মানুষের মতো মানুষ হইয়া সরকারী অফিস-আদালতে যাইব,
বিদেশে যাইব, বিদেশী গো লগে বুক ফুলাইয়া ক্যাটরম্যাটর ইংরেজীতে কথা কইতে
হ্যাগো বুক কাঁপব না।'
করতালিতে কতটা প্রশংসা আর কতটা তাচ্ছিল্য বেড়ে ওঠে, হাজি বশির উল্লা বুঝতে
পারেন না, তবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে স্কুল নিয়ে সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা মাইকে গমগম
করে বেজে ওঠার আনন্দে তিনি বিভোর হয়ে থাকেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঝক্কি-ঝামেলা শেষ হলে, রাতে স্কুলের প্রিন্সিপাল রেবেকা
ইসলাম ও তাঁর স্বামী সিরাজুল ইসলাম বশির ভিলায় আসেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার নেপথ্য
নায়ক-নায়িকা তাঁরাই। এমএ পাস করার পর রেবেকার বিয়ে হয়েছে। দু'বছর না
কাটতেই সন্তান হয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে চাকরির বয়স পেরিয়েছে। কিন্তু চাকরি আর
হয়নি কোথাও। স্বামী সিরাজুল ইসলাম স্থানীয় হাইস্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক। তাঁরই
একনিষ্ঠ চেষ্টা-তদ্বিরের ফসল আজকের সফল অনুষ্ঠান এবং ফুলকলির শুভযাত্রা।
নাম ফাটছে অবশ্য হাজি সাহেবের। আরও ফাটুক, স্কুলের পিছনে হাজির আগ্রহ ও
পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য দেশময় তাঁর নাম ফাটাতে জনাব ও বেগম
ইসলামের আপত্তি নেই। কেননা টাকা খরচের সঙ্গে দু'জনের প্রতি হাজি বশির উল্লার
আস্থা ও নির্ভরশীলতা ক্রমেই বাড়ছে। সবচেয়ে বড় কথা, সিরাজুল ইসলামের বেকার
স্ত্রী সম্ভাবনাময় স্কুলটির পরিচালক তথা প্রিন্সিপাল হিসাবে আজ জনসমক্ষে
আত্মপ্রকাশ করেছেন। কৃতজ্ঞতায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনই এখন হাজিকে চাচা ডাকেন।
আপনি বলছিলেন মাইকে ভাষণ দেয়ার অভ্যাস নেই আপনার। অথচ আজ এত সুন্দর
বক্তৃতা করেছেন চাচা, বলার মতো নয়।
চাচা, এক্সসিলেন্ট! সত্যি দারুণ বলেছেন আপনি।
হাজি সাহেবের বক্তৃতার 'শিশিগুক্ষা' এবং স্কুলে ফার্স্টক্লাস ইটা বানাবার অঙ্গীকার
নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে বাসায় অনেক হাসিঠাট্টা করেছে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার সময়
তাঁদের সেই হাসিটাও ঠোঁটে লেগে থাকে। কিন্তু হাজি সাহেবের কানে এখনও প্রচণ্ড
করতালির আওয়াজ।
আমার কাম আমি কইরা দিলাম। অহন তোমরা মন দিয়া স্কুলটা গইড়া তোলো।
চিন্তা করবেন না চাচা। আপনি পেছনে থাকলে বছর পাঁচেকের মধ্যে স্কুলটাকে

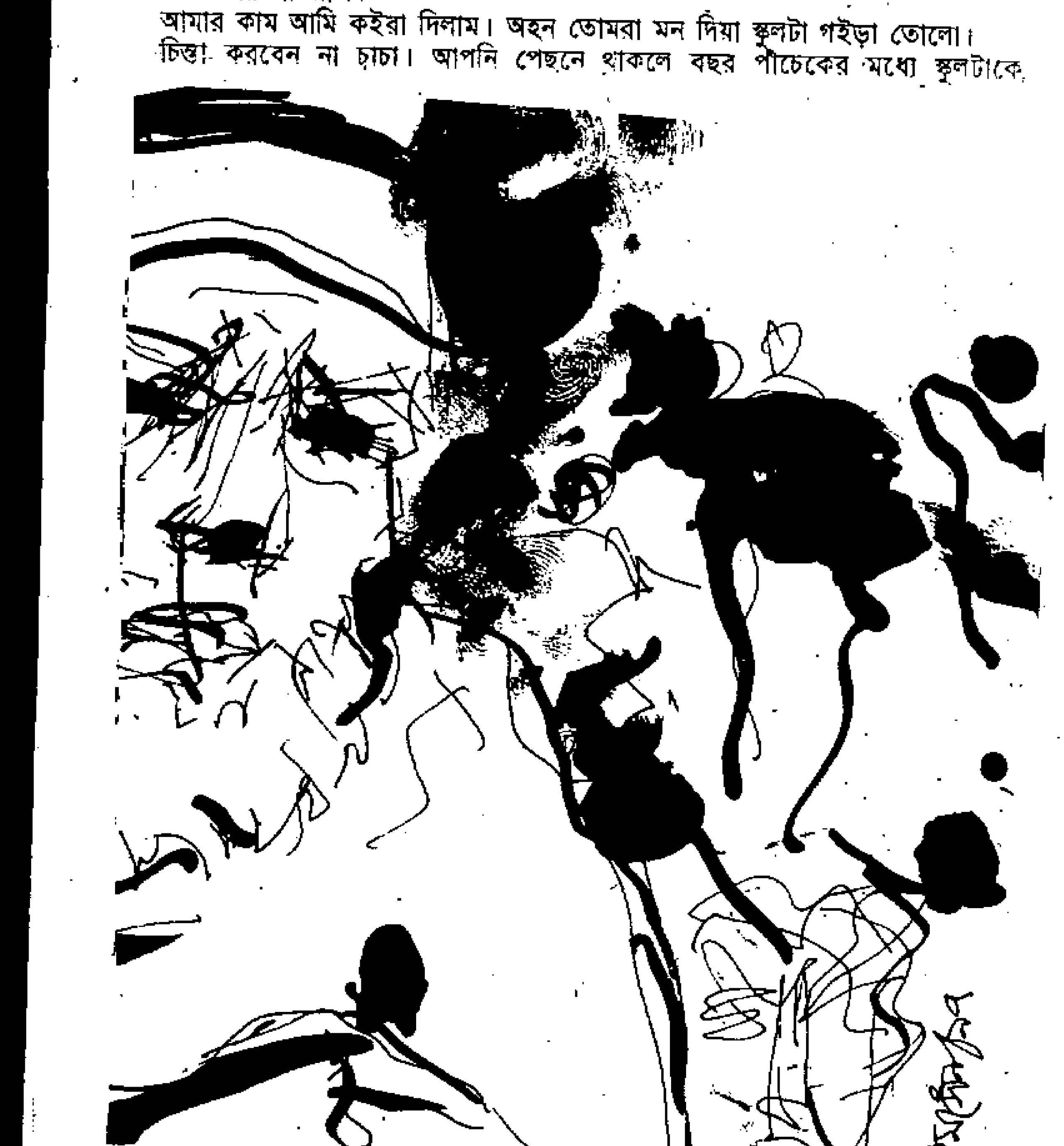

এমনভাবে দাঁড় করাব, ৫০ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়েও ছেলেমেয়েকে ভর্তি করাতে
কেউ দ্বিধা করবে না।
টাকার প্রসঙ্গ উঠলে হাজি সাহেব সতর্ক দৃষ্টি হেনে মানুষের ভিতরটাও দেখার চেষ্টা
করেন। সিরাজুল মাষ্টার স্কুলের আইডিয়া নিয়ে প্রথম যেদিন তার কাছে আসেন,
সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি স্কুল দিলে তোমার কি লাভ? স্কুল দিয়া লাভ
হইলে তোমারে কত পার্সেন্ট দিতে হইব?
সিরাজুল মাষ্টার লজ্জা হজম করতে না পেরে জিভে কামড় দিয়েছিল। সারা জীবন
টাকা ছাড়া যে মানুষ জীবনে প্রায় কিছুই দেখেনি, এমন অন্ধকে শিক্ষার মাহাত্ম্য
বোঝার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সিরাজ মাষ্টার। আবেগময় হয়ে উঠেছিল কণ্ঠস্বর।
আপনাকে কি করে বোঝাব হাজি সাহেব, টাকাটাই মানুষের জীবনের সব কিছু নয়।
মনের আনন্দের জন্য মানুষ অনেক কাজ করে। সমাজের উন্নতির জন্য। অপরের
মঙ্গলের কথা চিন্তা করেও মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে।
বক্তব্যের সমর্থনে হাতের কাছে বড় কোন দৃষ্টান্ত না পেয়ে সিরাজ মাষ্টার নিজের এবং
স্ত্রীর কথা বলেছিল। বড় কোন সরকারী চাকরি না হোক, ইচ্ছা করলে সে পুলিশের
সার্জেন্ট হতে পারত। ঘুষ খেয়ে অঢেল টাকা কামাতে পারত। কিন্তু তা না করে হাই
স্কুলে শিক্ষকতা করছে কেন? আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করে তার স্ত্রী
ইচ্ছা করলে যেনতেন একটা চাকরি, চাকরি না করুক, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনের
মডেল হয়েও টাকা রোজগার করতে পারত। কিন্তু সেসব না করে মহল্লায় তারা একটা
নতুন কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে তোলার কথা ভাবছে কেন? ভাবছে, কারণ তারা
মহল্লায় একটি ভাল জিনিস গড়তে চায়। নিজ হাতে একটা ভাল জিনিস গড়ার যে
আনন্দ তাও পেতে চায়।
সারা জীবন টাকার পিছনে ছোটার একঘেয়ে ক্লান্তি কাটাতে সিরাজ মাষ্টারের মতো
মনের আনন্দ-তৃষ্ণা কি হাজি বশির উল্লার মনেও জেগেছিল? নাকি ছেলেমেয়েদের
শিক্ষিত করে তুলতে না পারার গভীর বেদনা বোধ? কোন্টা বেশি কাজ করেছে জানে
না সে। তবে সিরাজুল মাষ্টারের কথাগুলোকে সেদিন বড় খাঁটি মনে হয়েছিল।
মাষ্টারের ভাল কথাগুলোকে গুরুত্ব দেয়ার ফলে হয়ত হাজি সাহেবে আজ অমন
সুন্দর বক্তৃতা দিতে পেরেছেন।
শোনো, আউজকা ভাষণে স্কুল লইয়া যেমুন দামী দামী কথা হইল, সেই কথাগুলোরে
স্মরণ রাইখা স্কুলটা সুন্দর মতো চালাও। আমি বাঁইচা থাকতে স্কুলের আয়-ব্যয়
লইয়া তোমাগো চিন্তা করতে হইব না।
তা তো বটেই চাচা। আপনি নিজের নামে করতে দিলেন না, কিন্তু সবাই জানে স্কুলটা
আসলে আপনারই।
আরে মিয়া কও কি! আমার নাতি বাবলায় কয়, এইডা নাকি তার স্কুল। হ্যায় মাষ্টারি
করব।
নাতির প্রসঙ্গ তুলে হাজি সাহেব হাসেন। প্রিন্সিপাল ও তার স্বামী চেয়ারম্যান
সাহেবের হাসিকে সঙ্গ দিতে নিজেরাও শব্দ করে হাসে।
বাবলা একটু দুষ্টু টাইপের, কিন্তু বেশ ইন্টিলিজেন্ট। একটু কেয়ার নিলে ক্লাসে নিশ্চয়
ফার্স্ট হবে।
হাজি সাহেব এবার আঁতকে ওঠেন। আমার নাতি বইলা ও ফার্স্ট হইব, ওরে বেশি
যত্ন নিবা, এইটা ঠিক না। স্কুলের সকল পোলাপানরে আমার নাতি মনে কইরা সবার
প্রতি সমান যত্ন লইবা।
চাচা, আপনি সত্যই মহৎ। হাজী মোহসিনের মতো আপনার নামও একদিন
ইতিহাসে লেখা হবে।
এইসব কথা বলে প্রিন্সিপাল ও তার মাষ্টার স্বামী বিদায়ের আগে হাজি বশির উল্লার
পা ছুঁয়ে সালাম করে যায়।
বছর না ঘুরতেই, স্কুল নিয়ে বড় ধরনের সঙ্কট শুরু হয় হাজির নাতি বাবলাকে কেন্দ্র
করে। দ্বিতীয় সাময়িকী পরীক্ষায় দেখা যায়, বাবলা সকল বিষয়ে ফেল করেছে এবং
ইংরেজীতে পেয়েছে বড় ধরনের গোল্লা। বাবলার মা এটা সহজভাবে মেনে নিতে পারে
না (কোন্ মা-ই বা পারে!)। মেজাজ বিগড়ে গেলে বাসার কাজের মেয়েদের সে
যেভাবে বকে, সেরকম মেজাজ নিয়ে হাজির পুত্রবধূ নিচতলায় নেমে আসে।
প্রিন্সিপালের রুমে ঢুকে সে সরাসরি জানতে চায়, আপনারা পাইছেন কী! এইরকম
গোল্লা দিয়া দিয়া আমার পোলারে মানুষ বানাইবেন? প্রিন্সিপালের জবাব ও
সান্ত্বনাবাণী তাকে শান্ত করতে পারে না। তুচ্ছ এক স্কুলের মাষ্টারনীদের সঙ্গে ঝগড়া
করার অরুচি দেখাতে, ক্লাসে ঢুকে বাবলাকে টেনে নিয়ে সে উপরে চলে যায়।
বাবলার পিতার প্রতিক্রিয়া হয় আরো মারাত্মক। ব্যবসা-বাণিজ্য দেখার কাজে পিতার
দায়িত্ব এখন তাকে সামলাতে হয়। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয়
তাকে। স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে তার যে কোন রকম সম্পর্ক আছে, বাড়ির লোকজন দূরের
কথা, স্বয়ং স্ত্রীর চোখেও তা ধরা পড়ে না। দিনের বেলা টেলিফোনে স্ত্রীর সঙ্গে
প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হয়। তবে গদিতে বসেও সে পিতার নতুন ব্যবসা ফুলকলি
স্কুলের নানান খবরাখবর লোকমুখে পেয়ে থাকে। দোকানের কর্মচারী ফয়জার বাবার
স্কুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একদিন ফয়জার মিষ্টির প্লেটসহ মনিবের সামনে হাজির
হয়। তার ছেলে শামসু এবারও পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। অঙ্কে ৯৫, ইংরেজীতে ৮০
পেয়েছে। সেই আনন্দে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে ফয়জার। অধস্তন কর্মচারীর পুত্রের কৃতিত্বে
মিষ্টি খাওয়ার সময় নিজ পুত্রের কথা মনেও ছিল না নসিরের। স্ত্রীর টেলিফোন পেয়ে
ফয়জারের মিষ্টির ভিতরে এত বিষক্রিয়া শুরু করে যে, গদিতে শুয়েও আর স্থির
থাকতে পারে না সে। অবেলায় বাড়িতে ছুটে যায়। অতঃপর স্কুল নিয়ে পিতা-পুত্রের
স্নায়ুযুদ্ধ ক্রমে নাটকীয় রূপ ধারণ করে।
বাবা, বাড়িতে একটা স্কুল বানাইলেন। একবার জিগাইলেনও না। স্কুল চালান কি
আপনার কাম?
আমার কারবার লইয়া তোরে মাথা ঘামাইতে হইবে না।
মানষে কত রকম টিটকারি কাটে। পোলাপান গো শিশি-বোতল বানাইতাছেন,
শিশিতে বিষ ঢাইলা দিতাছেন।
মানুষ হালায় হাজির কোন্ কারবারটা ভালা চোখে দেখছে!
দান-খয়রাত করতে চাইলে মসজিদে দ্যান, এতিমখানা বানান। ইংরেজী স্কুল
বানাইয়া সিরাজ মাষ্টারের মতো শিক্ষিত টাউটগো খপ্পরে পইড়া কী ... ফায়দা
হইতাছে!
আমার স্কুল লইয়া তোগো এতে খাউজানি ক্যা?
আপনার স্কুলে ফকিরনীর পোলা ফার্স্ট হইব, আর আমার পোলায় গোল্লা খাইব! এর
লাইগা বাবলারে আপনার ডাস্টবিনে আইনা হান্দায় দিছেন? ৫০ হাজার লাগুক, আর
এক লাখ লাগুক, ডোনেশন দিয়া আমি বাবলারে এই বছরই ঢাকার নামী স্কুলে
আবার ভর্তি করামু। আপনি থাকেন আপনার এই স্কুল লইয়া।
হাজি বশির উল্লার ব্যবসা নিয়ে ছেলেরা কখনও পিতার সামনে তর্ক করার সাহস পায়
না। ব্যবসা-বুদ্ধিতে ছেলেদের তুলনায় পিতা যে অনেক বেশি সেয়ানা, মহল্লাবাসী
জানে, ছেলেরাও মানে, স্বয়ং হাজি সাহেব বোঝে সেটা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু স্কুল
নিয়ে বড় ছেলে নসির মুখের ওপর অপমানজনক এত কথা বলার পরও হাজি সাহেব
নীরব হয়ে যান। তাঁর গাম্ভীর্য ক্রমে বিষাদঘন হয়ে ওঠে। দাদুকে সঙ্গ দেয়ার জন্য
বাবলাও আর কাছে ভিড়ে না।
সঙ্কট নিয়ে আলোচনার জন্য প্রিন্সিপাল তার স্বামী এবং সহকর্মী দুই শিক্ষিকাকে নিয়ে
সন্ধ্যার পর স্কুল কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে আসে। তারা কথা বলার আগে
চেয়ারম্যান হতাশ কণ্ঠে জানতে চায়, আমার নাতিটার বেরেন কি খুবই খারাপ?
প্রিন্সিপালের পক্ষ থেকে তার স্বামী সঙ্কটের কারণ ব্যাখ্যা করে। বাবলার ব্রেনে
প্রয়োজনীয় ঘিলু ঠিকই আছে। আসলে নতুন অবস্থায় টিচাররা বাবলার বিশেষ কেয়ার
নিতে পারেনি। তাছাড়া হাজি সাহেব বলেছিলেন সব ছাত্রকে তার নাতি-জ্ঞান করে
সমান নজর রাখতে। আর প্রিন্সিপাল ভেবেছিল, সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষায় বাবলা যদি
ফেলও করে, তেমন ক্ষতি নেই। এতেই বরং স্কুলের ইমেজ মানে সুনাম বাড়বে।
লোকে ভাববে, হাজি সাহেবের স্কুলে নিয়মনীতি বড় কড়া, সেখানে তার নাতির
প্রতিও পক্ষপাত হয় না।
সিরাজ মাষ্টারের এসব যুক্তিতে হাজি সাহেব খুব একটা সান্ত্বনা পান না। খেদের সঙ্গে
জানান, কিন্তু আমার নাতি যদি এই স্কুল ছাইড়া অন্য স্কুলে ভর্তি হয়, তাইলে কি
স্কুলের সুনাম বাড়ব?
অন্য স্কুলে যাবে কেন! ফাইনাল পরীক্ষায় বাবলা ক্লাসে অবশ্যই ফার্স্ট হবে চাচা।
ফার্স্ট হবে কেমনে?
আমরা সবাই তাকে বিশেষ কেয়ার নেব। সুন্দর করে পড়াব। কোন্ বাচ্চাকে কী
কায়দায় সুন্দর করে পড়াতে হয়, আমরা জানি চাচা।
হাজি বশির উল্লার গাম্ভীর্য তবু কাটে না। প্রিন্সিপালের সুন্দর পড়ানোর প্রতিশ্রুতি
পেয়ে তাঁর মাথা নড়ে শুধু।